বঙ্গবিদ্যা

INTERNATIONAL JOURNAL OF BENGAL STUDIES

2011-2012

Volume - 2-3

International Society of Bengal Studies
60, Patuatola Lane, Kolkata - 700 009

BANGAVIDYA
International Journal of Bengal Studies
2011-2012, Volume - 2-3

First Published
2012

Editor
Amitava Chakraborty

Published by
International Society of Bengal Studies
Contact Address
C/o Viswakos Parisad
60, Patuatola Lane, Kolkata - 700 009
Ph. 2257 3452, 6414 9434

Printed in India by
BCD Offset
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

Distributed in India by
Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073

₹ : 350.00
BDT : 500.00
USD : 8

সূচিপত্র

বড়ুর রাধা থেকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা : নারীভাষার নতুন স্বর	*নবগোপাল রায়*	৫
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলন দ্বারা সমাজের রূপান্তর সাধন	*সুখেন্দু কুমার বাউর*	২৫
নদীয়া জেলার লোকধর্ম : উদ্ভব-বিকাশ ও সাম্প্রতিক অবস্থা	*প্রবীর প্রামাণিক*	৪১
বাংলা বাইবেলের দুশো বছর (১৮০৯-২০০৯) : একটি সমীক্ষা	*সুরঞ্জন মিদ্দে*	৫৫
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও রবীন্দ্রনাথ	*অনল বিশ্বাস*	৬৭
রবীন্দ্রনাথ ও রায় পরিবার	*সুখেন বিশ্বাস*	৭৮
অভিনয়ে ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা	*শম্পা ভট্টাচার্য*	৮৬
বাংলা সাহিত্যে প্রতিবাদ : বিবর্তনের গতিমুখ	*অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়*	৯৩
বাংলা কথা-সাহিত্যে তেভাগা কৃষক-সংগ্রাম	*সুস্নাত দাশ*	১০০
সুবোধ ঘোষের গল্প : আলো-আঁধারের বিক্ষিপ্ত বিচ্ছুরণ	*বর্ষা বিশ্বাস*	১২৬
বাণী বসুর উপন্যাসে দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর অবস্থান	*শ্রীতা মুখার্জী*	১৪১
বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য : সম্পাদনা ও প্রকাশনা সমস্যা	*তন্ময় কুণ্ডু*	১৪৭
উনিশ শতকে অসমিয়া বিদ্বৎসমাজের বাংলাচর্চা	*প্রসূন বর্মন*	১৫৯
অসমের সাম্প্রতিক বাংলা গল্প : অশান্ত সময়ের দলিল	*জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত*	১৬৬
বাংলা ও অসমীয়া লোককথা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ	*তপতী সাহা*	১৭৬
অসমের দ্বিভাষিক বাংলা ভাষায় অসমিয়া প্রভাব	*সঞ্জয় দে*	১৮৩
শ্রী অরবিন্দের চিন্তাধারায় সমকালীন প্রসঙ্গ	*এন. এইচ. এম. আবু বকর*	১৯৫
অস্তিত্বহীনতা থেকে আন্দোলনের পথে : বাংলার উদ্বাস্তু জীবনের কয়েকটি টুকরো ছবি	*অনিন্দিতা ঘোষাল*	২০৩
পশ্চিমবঙ্গের মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতি : সংকটের নবরূপ	*আলাউদ্দিন মণ্ডল*	২২৫

Bengali Studies in Poland *Elżbieta Walter* ২৩২
Imagining Love in Early Twentieth Century
Bengal : Santisudha Ghosh's *Golokdhãdha*
and Sabitri Roy's *Meghna Podma* *Sutanuka Ghosh* ২৪৪
Sarat Chandra's women : Devi or dasis? *Subhadra Mitra Channa* ২৫৯
Girish Chandra's *Macbeth :* Colonial Modernity
and the Poetics of Translation *Abhishek Sarkar* ২৭০
The East Bengal Refugees *Chittabrata Palit* ২৭৭
Tradition and the Individual : 'Newness'
in Bengal's Navya Nyāya. *Nilanjan Das* ২৮৫

বড়ুর রাধা থেকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা : নারীভাষার নতুন স্বর

নবগোপাল রায়

"নূতন মঙ্গল আশে ভারত সরস ভাষে..." একি শুধুই কথার কথা? না এর মধ্যে সত্যিই কোনো নূতন কথা আছে? কবির ভারতচন্দ্র রায় মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত কাঠামোকে ধরে রেখেই তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যকে 'নূতনমঙ্গল'-এর রূপ দিলেন। সমালোচকেরা বলেন, "ভারতচন্দ্র অনেকটাই বেপোরোয়া হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রান্তসীমায় এসে।" আসলে গতানুগতিক এবং ক্লান্তিকর মঙ্গলকাব্যধারার অনুবর্তনকে কবি আর কিছুতেই মানতে রাজি হননি, তাই নিয়ে এলেন 'বিদ্যাসুন্দর' অংশ। কিছুটা নূতন করে ভেঙে কিছুটা সম্পূর্ণতই গড়ে নিলেন নূতন করে। এই নূতনের পরিকল্পনা, ছাপ স্পষ্টতই দেখা যায় 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে। যেখানে নারীরা নিজেদের অ-সাম্যের অবস্থান, জ্বালা-যন্ত্রণার কথা, মর্ম-যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য প্রথাগত বৈশিষ্ট্য হলেও; 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে ভারতচন্দ্র রায় যেভাবে নারী শিক্ষা এবং তাদের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক নারীভাষার স্বর শুনিয়েছেন তা অষ্টাদশ শতকের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে পাল্টে যাওয়া নূতন জীবন চেতনা। যে পতিনিন্দা অংশ কোনোভাবেই দৈব প্রভাবের কড়া শাসানি মানে না, তীব্র খোঁচা, চরম বাস্তবতা দিয়ে কবি অকপটে তুলে ধরেছেন সেই নারীদের জীবনের চাওয়া-পাওয়ার কথা। লক্ষণীয় মধ্যযুগীয় বাতাবরণে থেকে ভারতচন্দ্রের এই ভাবনা আমাদেরকে নতুনভাবে ভাবতে শেখায়।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদে সমাজের একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সুখ-দুঃখের কথা পাই। এদের জীবন অভাব অনটনে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত সমাজের নারীদের মতো সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক পরাধীনতা ছিল না। কারণ এরা ছিল শ্রমজীবী; সম্ভবত এই কারণে নারীর পারিবারিক তথা ব্যক্তিগত বেদনার প্রসঙ্গ চর্যা সাহিত্যে তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। বরং চর্যাপদের শবর-শবরীর উন্মত্ত প্রেমলীলা আর ডোম রমণীর প্রতি ব্রাহ্মণের অবৈধ আসক্তির পরিচয় থেকে মনে হয় "এই অন্ত্যজ সমাজে নর-নারীর যৌন সম্পর্কের কঠোরতা ছিল না।"[১] মধ্যযুগের সূচনা পর্বে বড়ু চণ্ডীদাসের আখ্যান কাব্যে আমরা দেখি রাধা আর কৃষ্ণ একেবারেই মধ্যযুগের গ্রাম বাংলার মানব-মানবী। সেখানের দম্পতির কথা

রায়, নবগোপাল : বড়ুর রাধা থেকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা : নারীভাষার নতুন স্বর
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 5-24

উল্লেখিত হলেও দাম্পত্য জীবনের কথা নেই। কাব্যে দেখি মর্তধামে রাধারূপে পরিচিত, তার বিবাহ হচ্ছে নপুংসক আইহনের সঙ্গে। নপুংসক আইহনের সঙ্গে শুরু হয় রাধার দাম্পত্য জীবন, কিন্তু সেই দাম্পত্য সম্পর্কে কোনো পূর্ণতা ছিল না। তাই কৃষ্ণের আহ্বান কিংবা তার শক্তি প্রয়োগ রাধাকে পথভ্রষ্ট করে। বড়ু চণ্ডীদাসের রাধা বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিপূর্ণ মানবী অস্তিত্বের তীব্র দ্যুতিতে ভাস্বর। এই রাধা 'তীনভূবনজনে'র মনমোহিনী, সেই সঙ্গে পুরুষের কামনাকে আকর্ষণ করে নেওয়ার মাদকতা তার সর্বাঙ্গে, তাই সে 'রতি রসকামদোহনী'। কিন্তু কৃষ্ণের তীব্র কামনার উত্তাপে এই স্বর্ণ প্রতিমার রূপ বিগলিত হয়েছে অন্য রাধার। রাধা সম্পর্কে সমালোচক বলেছেন, "হিন্দুর ঘরের মেয়ে, মনে সতীত্ববোধ গাঁথিয়া আছে। সংস্কার তাহার চিরকালের সম্পদ।"[২] কিন্তু রাধার সংস্কার যদি সম্পদ হয় তাহলে বলতে পারি একে রক্ষা করবার ক্ষমতা বা অধিকার কিছুই সমাজ তাকে দেয়নি, তাই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এবং সেই কাব্যের রাধা পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের কামনার বলিমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। অসামান্য মানসিক দৃঢ়তা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়েও কৃষ্ণের কাছে দেহদানে বাধ্য হয়েছে। নারীত্বের এই অপমানিত ধূলিলুণ্ঠিত সত্তার আর্তনাদই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর রাধা চরিত্রের কণ্ঠে উচ্চারিত। তাঁর মন যখন পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রথাবদ্ধ নিশ্চিত নিরাপত্তার মধ্যে নিজের অস্তিত্বের অবস্থানে আনন্দিত তখন পুরুষ শাসিত সমাজের পুরুষ জোর করে তার নারীত্ব হরণ করছে। আর যখন রাধা কৃষ্ণের প্রেমে আকুলা হয়ে প্রেম বশে তাকে পেতে চাইছে তখন সে নিষ্ঠুর ভাবে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। সেই পুরুষের কাছে নারীত্বের যেমন কোনো মূল্য নেই তেমনি নারীর আকুণ্ঠ নিবেদনেরও কোনো মূল্য নেই। ওই সামন্ত শাসিত বাংলা সমাজে, কৃষ্ণের হাতে আত্মসমর্পণের অনিচ্ছা প্রকাশে তার ব্যক্তিত্বের পরিচয় অন্যদিকে আত্মনিবেদনে ইচ্ছুক রাধা সামাজিক বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিণী। "সে সামন্ত শাসিত বাঙালি সমাজের প্রথম নতজানু বিদ্রোহিণী"[৩] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে এই অনিচ্ছুক নারীর শরীর আর মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত করে তাকে প্রত্যাখ্যান করার বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি কৃষ্ণের নয়, যেন সমগ্র মধ্যযুগীয় সমাজের।

যদি আমরা আখ্যানধর্মী কাব্যই লক্ষ্য করি তাহলে দেখব মঙ্গলকাব্যের পরিকাঠামোতে সেই নারীরা ক্রমশ নিজের খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে দেখি চণ্ডী শিবের দাম্পত্য জীবন সংকটের মুখোমুখি হয় মনসার উপস্থিতিতে। শিবের এই মানসকন্যাকে নিজ পরিসরে অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ চণ্ডী। মনসা এবং শিবের শত অনুরোধকে তুচ্ছ করে চণ্ডী নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। মনসার স্থান হয় সাঁতালি পর্বতে—

"অন্তরে বিষাদ পদ্মা বলে মৃদু স্বরে।
তেজিয়া তোমার ঘর যাব কোথা কারে।।
সতমা হইয়া এত করে অপমান
কতেক লাঞ্ছনা আর চক্ষু হৈল কাণ।।
এতসব দুঃখ পদ্মা বিসরিয়া মনে।
পুররপি ধরিলেক চণ্ডীর চরণে।।"[৪]

পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তার বাইরে মনসার এই অবস্থানে নারীর আচরণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। সামাজিক অবস্থান ভেঙে শুধু পুরুষই নয় নারীও অনেক সময় উৎপীড়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন, তা চণ্ডীর আচরণে পরিস্ফুট। গণেশ কার্তিক যে পরিচয়ে সমাজে স্থান লাভ করে, মনসা সেই একই পরিচয়ে সমাজচ্যুত হয়। অবৈধ সম্পর্কের ফলাফলের প্রতি সমাজের যে ঘৃণা, অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনকারীর সম্পর্কে সমাজ অনেকটাই নিশ্চুপ, নারীদের সম্পর্কে রক্ষণশীল মনোভাব থাকলেও, পুরুষদের আচরণের প্রতিবাদ করা তো দূর, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকাই সমীচীন মনে করে সমাজ, দেবসমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। মনসার প্রতি চণ্ডী অথবা শিবের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ কেউ করে না। এই মনসা যেভাবে শারীরিক ও মানসিক ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে কেউ মুখও খোলে না, "সামাজিক সম্মান, অর্থনৈতিক ভিত্তি যে লিঙ্গগত বিরুদ্ধতার ভিত্তি তা চণ্ডীর আচরণে পরিস্ফুট।"

চাঁদ ও সনকার দাম্পত্য জীবনেও সনকার অস্তিত্ব শূন্য। কারণ চাঁদ যেভাবে সনকাকে চালান, তিনি সেভাবেই চালিত হতে বাধ্য হন। চাঁদের আরাধ্য দেবতা শিব, সুতরাং তাকে ছাড়া পুজো করতে পারবে না। যদি করেন, তবে সে পূজা পণ্ড করবার অধিকার পুরুষের আছে, নারীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা সেখানে গৌণ—

"দেখিয়া পদ্মার পূজা ক্রোধে কাঁপে চাঁদোরাজা
হেতালের দণ্ড করে ধরি।
আপদ সঞ্চারে নৃপ আপনা পাসরে কোপে
ভাঙিলেক মনসার বারি।"[৬]

চাঁদকে যদি সে যুগের পুরুষ সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করি, তাহলে সমাজে নারীদের অবস্থান খুব স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত হয়ে যায়। আবার চাঁদ সনকার সুখের জীবনে দুঃখের জোয়ার নিয়ে আসে মনসা, কিন্তু নারী দেবতার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করেন চাঁদ। এই নারী দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য শুরু হয় চাঁদ মনসার দ্বন্দ্ব। কিন্তু সমগ্র মঙ্গলকাব্যে দেখি কোনো পুরুষদেবতাকে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য এমনভাবে লড়াই করতে হয়নি। এতে সেই সমাজের নারীদের অবস্থানটা বুঝতে পারি। চাঁদের মহাজ্ঞান হরণের জন্য সনকার বোনের ছদ্মবেশে এসে মনসা চাঁদকে ছলনা করেছেন। কামমোহিত চাঁদ বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে সনকাকে অনুরোধ করেন, যাতে সনকা তার বোনকে চাঁদের অঙ্কশায়িনী হতে বাধ্য করেন—

"গুপ্তে সনকার ডাকি বুঝাইয়া বলে।
তব ভগিনী দেখি অঙ্গ দহে কামানলে।।
তারে বুঝাইয়া প্রাণ রাখহ আমার।
কর্ণে হস্ত দিয়া রাণী করে হাহাকার।"[৭]

বক্তব্যটি বাহ্যদৃষ্টিতে অনুরোধ মনে হলেও তা আদেশেরই নামান্তর মাত্র। নারীত্বের যে কতখানি অবমাননা ঘটেছে তা ভাবলে আমাদের অবাক করে দেয়। কিন্তু চাঁদের এই ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের ভাষা নেই সনকার। দাম্পত্য জীবনের বিশ্বাস যেন তার কাছে মলিন হয়ে যায়, তাই লক্ষ্মীন্দরেরও সাপের কামড়ে বাসর ঘরে মৃত্যু হলে স্বামীকে সান্ত্বনা নয়, বরং তিরস্কার করেন সনকা। কারণ

তিনি জানতেন ছেলের সর্পদংশনে মৃত্যু হবে তাই ছেলের বিবাহ দিতে চাননি। অন্য ছয় ছেলের মৃত্যুতেও বিলাপ করার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদকে মনে করিয়ে দিতে ভোলেন না যে, সন্তানের মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী—

"কুপিল সনকা রামা চাঁদোর বচনে।
অধোগতি হবে রাজা কুবুদ্ধি কারণে।
যদি তুমি পূজা করো মনসা কুমারী।
কেন পুত্র মরিবেক রূপের মুরারি।"[৮]

সনকার বিরহের যন্ত্রণা তার একার। এই সমস্ত যন্ত্রণার মূলে রয়েছে মধ্যযুগীয় বাঙলার পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও মধ্যযুগীয় বাংলায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোটি খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, নারীর জীবনে একদিকে দারিদ্র, অন্যদিকে পুরুষের জোর নারীজীবনকে বিষিয়ে তুলেছে। রাজকন্যা উমার বিবাহ হয় চিরভিখারী শিবের সঙ্গে। সাংসারিক প্রয়োজন বা অভাব প্রতিনিয়ত উমাকে বিচলিত করে তোলে, "আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।/তবে সে আনিতে নাথ পারি হে তণ্ডুল।"[৯] শিব কিন্তু এই সমস্যাকে উপলব্ধি করতে পারেনা, বলা ভালো, করতে চায় না। স্ত্রীকেই অশান্তির জন্য দায়ী করে অনায়াসে সংসার ত্যাগ করে চলে যান। এখানে দেখি পরিবারকে রক্ষা করবার জন্য একটি নারী যতটা সচেষ্ট, একটি পুরুষ কখনই নয়।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন অনাচারের শিকার হয় নারীরা। পুরুষরা তাদের কামক্ষুধাকে চরিতার্থ করবার জন্য বহুবিবাহের বিধান তৈরি করেছে। স্বামী বা স্ত্রীর উপর অসপত্ন অধিকার ভোগ প্রত্যেকের কাছেই কাম্য। কিন্তু পুরুষের বহুগামিতাকে সমাজ স্বীকৃতি দিলেও নারীর বহুগামিতা নিন্দার চোখে দেখা হয়েছে। একজন পুরুষের কাছে বহুবিবাহ হল পুরুষত্বের জয়, এটা পুরুষ মনে করে, কিন্তু একজন নারী মনে করে বহুবিবাহ তার নারীত্বের অপমান, তাই স্বামীর অন্য স্ত্রীর প্রতি আকর্ষণে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে—

"আমার প্রাণনাথ ব্যাধ সুন্দর হে
এবে সে গেলা ছারে খারে।
ঘরেতে নাহিক ভাত কামিনীর বড়সাধ
পরনারী আনিছ মন্দিরে।"[১০]

কালকেতু ফুল্লরার জীবনে চণ্ডীর আগমনে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব তাদের সম্পর্ককে সংকটের মধ্যে ফেলেছে। 'বণিক খণ্ডে' আমরা ধনপতির দুই স্ত্রী লহনা আর খুল্লনাকে দেখি, যারা মধ্যযুগীয় বাঙালী পুরুষের বহুবিবাহ প্রথার ফাঁদে আটকে পড়া দুটি নারী। সেই সঙ্গে এখানে আছে আরো দুটি বেদনার্ত নারী খুল্লনার জননী রম্ভাবতী ও শ্রীমন্তের স্ত্রী সিংহল রাজকন্যা সুশীলা। এদের বিক্ষোভ, বেদনা, সপত্নী প্রথার বিরুদ্ধে, যে সপত্নী প্রথার মূলে আছে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা। 'বণিকখণ্ডে' ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার বিবাহে খুল্লনার পিতা রাজি হলেও খুল্লনার জননী রম্ভাবতী বলেছেন, "খুল্লনা বান্ধিয়া গলে/ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে/নাহি দিব দারুণ সতীনে।" অন্ধ সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নারীর জননী সত্তার বিদ্রোহ এখানে সোচ্চার, কিন্তু এ বিদ্রোহ ব্যর্থ বিদ্রোহ। রম্ভাবতীর প্রতিবাদ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত ধনপতির হাতেই খুল্লনাকে সমর্পণ করা হয়। অন্যদিকে এই বিবাহের ব্যাপারে ধনপতি লহনার কোনো অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ

করেনি। লহনা তার বিবাহের কথা লোকমুখে শুনেছে। ধনপতি কপটবাক্যে ভোলাতে এলে লহনা বলেছে তার যৌবন নেই বলেই স্বামী নাকি দ্বিতীয় বিবাহের কথা ভাবছে। লহনার একথা প্রমাণ করে পুরুষ শাসিত, বহুবিবাহ প্রথায় নারীরা কেবল পুরুষের ভোগ্যবস্তু, কেবল পুরুষের কাছে তাদের শরীরের যা কিছু মূল্য, ভালোবাসার কোন মূল্য নেই, নারীত্বের কোনো মূল্য নেই। পারিবারিক জীবনেও নারী বহু ভাবে বৈষম্যের শিকার হচ্ছে কখনো সতীন হিসাবে কখনো কন্যা হিসাবে। শ্রীমন্ত দ্বিতীয় বার রাজকন্যা জয়াবতীকে বিবাহ করলে সুশীলা বলেছে, "প্রথম বয়সে দুঃখ/ধরণ না যায় বুক/কোন দোষ দিলে মোরে সতা।/ভাই বন্ধু মাতাপিতা/জেবা মোর আছে যথা/সব ছাড়ি গোঙাই লাঙ-তোমারে।"[১১] সুশীলা পুরুষের বহুবিবাহে সোচ্চার হয়েছে, কিন্তু সুশীলার অভিমানে এখানে কোনো কাজ হয়নি। মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলে নারীদের এই মর্মান্তিক বেদনা ও বঞ্চনার ছবিকে স্পষ্ট রূপে তুলে ধরেছেন।

'শিবায়ন' কাব্য আবর্তিত হয়েছে দেব-দম্পতিকে কেন্দ্র করে। কাহিনীতে তাদের আবির্ভাব পৌরাণিক অনুষঙ্গে হলেও কাব্যের তৃতীয় পালা থেকে শুরু হয়েছে শিব-পার্বতীর লৌকিক প্রসঙ্গ এবং গৃহস্থ জীবনের কথা। পঞ্চম, ষষ্ঠ পালায় অন্য পৌরাণিক কথা আছে। আবার ষষ্ঠ থেকে অষ্টম পালায় শিব-পার্বতীর লৌকিক জীবন শুরু হয়েছে। এই লৌকিক পালায় সাংসারিক ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের একান্ত বাঙালি সমাজ ও মানসিকতারই অনুগামী করে তোলে। এই দম্পতির মিলন-বিরহ-কোঁদল অষ্টাদশ শতকের দাম্পত্য জীবনের নানা দিককে দেখায়। বালিকা গৌরীর 'বিবাহ খেলার বরকন্যা বিদায়' অংশতে দেখা যায় বালিকা গৌরী যখন পুতুল খেলায় কন্যা-জমাতাকে বিদায় করতে যান, তখন জামাইয়ের প্রতি তার অনুনয়—

"কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কৈর তুমি।।
আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিবা পেট ভর্যা ভাত।
প্রীত কৈর যেমন জানকী রঘুনাথ।"[১২]

জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম অন্নবস্ত্র এবং ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই চায় না গৌরীর। বালিকা কন্যার পতিগৃহে গমনের সময় মাতার করুণ ক্রন্দন এর চিত্র আমরা দেখতে পাই। এই সময় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমরা দেখি গৌরীদান প্রথা সমাজে প্রচলিত। এর ফলে বাচ্চা মেয়েকে কুল রক্ষার জন্য 'প্রায় শ্মশান যাত্রী' বরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হতো। তাতে যেমন তার জীবন সুখের হতো না, তেমনি বাবা-মা-রও চিন্তার শেষ থাকত না; 'রাণী মেনকার বিলাপ' অংশে দেখি এই বুড়ো বর দেখে রাণী মেনকা বিলাপ করছে। এবং তার স্বামী হিমালয়কে তীব্র ভর্ৎসনা জানাচ্ছে। মেয়ের বিয়ের জন্য বর পছন্দ করেছে পিতা হিমালয়। এতে স্ত্রী মেনকার কোনো ভূমিকা নেই, এ থেকে তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষদের স্বেচ্ছাচারের পরিচয়টিও ফুটে ওঠে। অবহেলিত মেনকার কণ্ঠেই যেন সেই সোচ্চার বাণী ফুটে উঠেছে :

"ভাতার চক্ষের মাথা খায়্যা বর আন্যাদেশ দিবেন মায়্যা,
ছি ছি ছি ছি কি বলিব তারে।
খেপা বুড়া দিগম্বর ধাক্কা মার্যা বাহির কর
আইবড় মোর ঝি থাকুক মোর ঘরে।"[১৩]

মেনকার মতামতের হয়তো গুরুত্ব ছিল না, বলে হিমালয়ের পছন্দ করা বুড়ো বরকে ধিক্কার করছে মেনকা। আসলে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের মতামতকে আমল দেওয়া হতো না। কন্যার চেয়ে অনেক বেশি বয়সের বর দেখে মেনকার আর্তনাদ যেন বিদ্রোহী সত্তার জন্ম নিচ্ছে : "বাছা তোর বর আন্যাছে চক্ষুর মাথা খায়্যা।' 'শাশুড়ীদের জামাইনিন্দা' অংশটি থেকে সামাজিক মানসিক অসংগতিগুলি ফুটে উঠেছে—

'চুকি বলে আরে মোর ছায় কপাল ছি।
অন্ধবারে বিহা দিনু চন্দ্রা হেন ঝি।।
শুয়্যা থাকে শয্যায় যুবতী কর্যা কোলে।
হাবাতিকে হারাইয়া হাতাড়িয়া বুলে।"

আবার, "মন্দোদরী কান্দ্যা মল্য মল্লিকার মোহে।
কুঁজা বরে বিভা দিয়া ভিজ্জা গেল লোহে।।
কোদণ্ডার মত সে কুণ্ডলকৃতি কুঁজে।
পুরা পুটলীয় পারা পড়্যা থাকে সেজে।।"[১৪]

তখন অন্যরা বলছে—

"চক্ষু চাপ্যা চাড়ু কর্যা চাড়ু বলে কি।
বঙ্ক বরে বিভা দিল বুধি হেন ঝি।।
শয্যায় শিশুর পারা শুয়্যা থাকে কোলে।
কদাচ কান্তের পারা কেহ নাই বলে।।
মাধুনী ধনীর তরে করে মনস্তাপ।
গোদা বরে সাধ্যা আন্যা বেটী দিল বাপ।।
বারমাস দারুণ গোদের উঠে ঘ্রাণ।
বিষম জঞ্জালে বাছা হারাইল প্রাণ।।"[১৫]

এভাবে নারীর কণ্ঠে কোথায় যেন পুরুষরা তীব্র ধিক্কার পাচ্ছে। জামাইরা, 'অন্ধ', 'কুঁজো', 'কুণ্ডলাকৃতি', 'বঙ্ক', 'গোদে' আক্রান্ত এগুলি শারীরিকভাবে সুস্থতার লক্ষণ নয় কিন্তু কুল রক্ষার জন্য মেয়েদেরকে এইরকম অযোগ্য করে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, যা তাদের সাংসারিক সুখতৃপ্তিকে বিঘ্নিত করেছে। এক নারী বলছে : "বুড়ো বরে বেটী দিয়া বুক ফাটিয়া মরে।" সমাজে তখন কৌলীন্য প্রথার রমরমা ছিল। ফলে কুল রক্ষার জন্য মা বাবারা বাধ্য হত বুড়ো বরে বিবাহ দিতে। বিবাহের ফলে নারী কিছুদিন পরে হয়তো বিধবাও হয়ে যেত, এই আবার বুড়ো বরে বিবাহ হবার জন্য নারী তার দৈহিক কামনা বাসনাকে তৃপ্তি করতে পারত না যার ফলে সংসারে সুখ ছিল না। শাশুড়িদের এই জামাইনিন্দা নিছক কৌতুকের ঘটনা নয়। এটি নারীর স্বতোপ্রণোদিত বিদ্রোহ। পুরুষতন্ত্রের স্থূল, গলিত রূপটি কিভাবে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে দেয় এর চিত্র আমরা তার মধ্য দিয়ে পাই। 'গৌরীর রন্ধন' অংশে গৌরীকে আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের ঘরনী হিসাবে পাই, যেখানে সংসার পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হয় তাকে—

"চর্ব্বচুষ্য লেহ্যপেয় তিক্ত কষায়ন।
অম্ব মধু চতুর্ব্বিধ ব্যঞ্জনের গন।।"[১৬]

সযত্নে তিনি রন্ধন করেন, রন্ধনের কোনো আলস্য তার নেই। স্বামী পুত্রগণকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াতেই যেন তার যা কিছু তৃপ্তি—

"যোত্র কর্যা পুত্র দুটী বসে দুই পাসে।
পার্ব্বতী পুরট পীঠে পুরহর বৈসে।।
তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।"[১৭]

এখানে আমরা দেখি শিব এবং দুই পুত্র শুধু খেয়ে যায় কিন্তু তাদের আহারের জন্য চিন্তা করতে হয় গৌরীকে এখানে শিব ঠাকুরের নিম্নমধ্য ভদ্র লোকের গৃহিণী গৌরী যেন বাঙালি গৃহকর্ত্রীর একটি প্রতিনিধি রূপ, কিন্তু শিবের ভিক্ষাবৃত্তিতে তো আর চলে না। সংসারের দারিদ্র্যর গৌরীকে অতিষ্ঠ করে তোলে—দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, ভিক্ষান্নে প্রতিপালিত সংসারের কর্ত্রী হওয়ার দায় অনেক। সন্তানদের মুখে অন্ন তুলে দিতে না পারলে মায়ের যে কী যন্ত্রণা হত তা গৌরী জানেন। কিন্তু সাংসারিক অনটনের কথা স্বামী বুঝতে চান না, উল্টে অনুযোগ করেন আবার স্বামীর কণ্ঠে অসংযমের এই অনুযোগ শুনে গৌরী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তিনিও শিবকে বুঝিয়ে দিতে ছাড়েন না, "বাপের বিভোগ নাই কি করিবে মায়।/দুগ্ধ পোষ্য ক্ষুব্ধ নাকি চুপু দিলে রয়।[১৮] আর্থিক দুরাবস্থার প্রেক্ষাপটে এই পারস্পরিক দোষারোপ নারী পুরুষে রচা সংসারের চেনা ছবিটাকে অনেক বেশি স্পষ্ট করে তোলে। কিন্তু এই অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ খোঁজে নারীমন। কারণ দারিদ্র্য তার ধাতে সয় না, তাই স্বামীকে অনুরোধ বা বোঝানোর চেষ্টা করেন ভিক্ষাবৃত্তি নয়, অন্য জীবিকা গ্রহণ না করলে সমস্যার সমাধান হবে না। তাই শিবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও গৌরীর জন্য শিব মর্তে চাষ করতে আসতে আগ্রহী হয়। এখানে গৌরীর ইচ্ছা শক্তির জয় হল।

এরপর শিব মর্তে চাষ করতে শুরু করল, ফসল ফলল কিন্তু পার্বতীর কথা শিব ভুলে গেল। কৈলাসে বারবার ফিরতে বলেও যখন কোনো লাভ হল না তখন মশা, মাছি, ডাঁশ, জোঁক প্রেরণ করে গৌরী শিবকে ছলনা করবার জন্য মর্তধামে বাগ্দীনীর ছদ্মবেশে এল : "কার্য্য হেতু কাত্যায়নী কিঙ্করীর বোলে।/বিমোহিনী বাগদিনী হৈল সেইকালে।।" স্বভাবতই দুর্বল চরিত্রের শিব, বাগ্দিনীর মোহে কামমোহিত হয়ে বাগ্দিনীকে পেতে চাইল, এমনকি তাকে পাবার জন্য নিজের স্ত্রীর নামেও তার অনুপস্থিতিতে তার নামে কটু মন্তব্য করতেও শিব পিছপা হন না, পুরুষের কাছে এক নারীকেন্দ্রিক জীবন, সাংসারিক দুঃখ ভোগে বড়ই স্বার্থহীন হয়ে পড়ে। ভিন্ন নারী গমনে যে রোমাঞ্চ জাগে মনে প্রাণে তাকেই আস্বাদন করতে চায় বহু পুরুষ। ফলে গৃহিণীর জীবনে দুঃখের মর্মান্তিক ছায়া নেমে আসে। একটু এগিয়ে আমরা দেখি শিব বাগ্দিনীকে পেতে ব্যর্থ হলে কামমোহিত হয়ে কৈলাসে গমন করলে গৌরী তাকে তীব্র ভাবে ভর্ৎসনা করে—

"তোর বাপ বাগ্দী হয়্যাছে ছাড়্যা মোকে।
তার ঠাঞি যায়্য নাই ছুঁয়্য নাই তাকে।।
বাগদিকে লাজ নাই ঘর ঢুকে মোর।
ছাল্যাপুল্যা ছুঁইলে ছুতুক হবে ঘোর।।

ভাল যদি চায়তো এখান হৈতে যাকু।
যেখানে রাখিয়া আল্য বাগদিনী মাগু।"[১৯]

আসলে শিবের সততার প্রতি আর কোন বিশ্বাস নেই গৌরীর। তাই হৃদয়ের গভীর মর্মলোক থেকে শিবকে তীব্রভাবে ধিক্কার করছে, শিবের চরিত্রের স্খালনকে ঘৃণা করছে। এটি মধ্যযুগীয় পুরুষের চরিত্রের সততার স্খলনের প্রতি নারীর তীব্র ক্ষোভ। আবার গৌরীর শাঁখা পড়বার ইচ্ছাকে কেন্দ্র করে শিব গৌরীর কোন্দল চরমে ওঠে। সাধ্বী নারী স্বামীর কাছ থেকে দুটি শাঁখা মাত্র চেয়েছেন। বিলাসিতার দ্রব্য হিসাবে নয়। বিশেষ দায়ে পড়ে, কারণ শাঁখা হল এয়োতির চিহ্ন, নইলে সধবা নারীর চলে না, হাতে শাঁখা না থাকলে কারও সম্মুখে হাত বের করা যায় না। কিন্তু নিরুপায় স্বামী স্ত্রীর এই সামান্য আবদারটুকুও রক্ষা করতে পারলেন না, দারিদ্র্যের আস্ফালনে চুর্ণ হয়ে গেল পার্বতীর শাঁখা পরবার সাধ। তীব্র দারিদ্র্যের ভাবনায় জর্জরিত স্বামী স্ত্রীর শাঁখা পড়ার সাধকে ব্যঙ্গ করে, এখানে দেখা যায় যে দারিদ্র্য নারীর জীবনে কি ভয়াবহ পরিণতি দিয়েছে। সে যে সধবা, তার লক্ষণ সে ব্যবহার করতে পারছে না। মেয়েদের দুর্বলতম স্থান বাবার বাড়ি। সমাজের চিত্র, যেখানে নারীর জীবনের কোনো মূল্য নেই। যখন খুশি তাকে বের করে দেবার, বা 'চলে যেতে' নির্দেশ দেন পুরুষরা। কিন্তু এই ঘটনাটি যদি একজন স্বামীর পক্ষে ঘটে, তাহলে তা তার কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘটা সম্ভব নয়, কারণ আমাদের সমাজটি এভাবেই বুনন করা হয়েছে। অবমাননার জন্য গৌরী সরব হচ্ছে, তাই শেষ পর্যন্ত নীরব হয়ে থাকেনি, স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাপের বাড়িতে প্রত্যাগমন করছে।

ঘনারামের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আমরা দেখি অষ্টাদশ শতকের সামাজিক পরিবেশে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান এবং নারী ও পুরুষগত বৈষম্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে। মঙ্গল কাব্যের এক সাধারণ রীতি নায়ক দর্শনে নারীগণের পতিনিন্দা। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গলের' জামতি পালায় লাউসেন ও কর্পুরকে দেখে নারীগণ পতিনিন্দা করেছে অপর পুরুষে সৌন্দর্য তাদের আকর্ষণ করে, তাই ঘরে থাকা কদর্য, যৌন ক্ষমতাহীন পুরুষদেরকে কোথাও অপছন্দের জায়গা থেকে নারীরা মনের ক্ষোভকে উদগার করছে —

"এক ঠাটী বলে মোর কর্ম্মফলে
পতি অতিশয় বুড়া।"[২০]

এখানে আমরা দেখি সমাজে যে অসম বিবাহ, তারই ক্ষোভ। স্বামী বুড়ো হবার জন্য নারীদের তীব্র কামাকাঙ্ক্ষা যেন দমিত হচ্ছে না। তাই নারী তার যৌনস্বাদে অতৃপ্ত থেকে বিদ্রোহ করছে, মুখের ভাষা খুঁজে পাচ্ছে। এখানে আমরা তৎকালীন সমাজের প্রচলিত গৌরীদান প্রথাকেও দেখতে পাই, যেখানে বাল্য নারীর সঙ্গে শ্মশানযাত্রী বুড়ো বরের সঙ্গে বিবাহ হতো, ফলে অকাল বৈধব্য তাদের গ্রাস করত। অন্তজনের পতি হল—"ঢিপে শোকা মোর খুড়া/শয়নের কালে স্বামী কাঁপে হালে।" শারীরিক ভাবে, অক্ষম পুরুষকে বিবাহ করতে বাধ্য হতো, কারণ তাদের স্বাধীনতা ছিল না ইচ্ছা মতো পতিগ্রহণ করবার, তাইতো সুযোগ পেয়ে নারী তার ক্ষোভকে প্রকাশ করছে। বলার অপেক্ষা থাকে না যে, পুষ্পিত যৌবনা নারীর কাছে শরীরের উপবাস কোনোভাবেই

কাঙ্ক্ষিত নয়। এদের সঙ্গী পুরুষেরা : 'স্বামী অন্ধ', 'পায়ে কুড়া গোদ', 'এনে কোঁথা জ্বর/কাঁপে থর থর', 'হাবা গোবা, বোবা', 'পিঠভরা কুঁজ', 'কালা কানা খোঁড়া'। পতিনিন্দায় মুখর নারীরা সকলই স্পষ্ট বাচনে জানায় তাদের পুরুষদের অসংগতির কথা। নারীদের পতি নিন্দার মধ্যে পতিদের এই যে অসংগতি তা 'হাস্যরসের যোগানদার' না হয়ে যৌবনবতী স্ত্রীর অতৃপ্ত যৌনচেতনাকে প্রকাশ করেছে। নারীগণের পতিনিন্দা, মঙ্গলকাব্যের কোনো কৌতুককর বর্ণনা নয়, নারীর স্বতঃপ্রণোদিত বিদ্রোহ। পুরুষতন্ত্রের স্থূল, গলিত, দুর্গন্ধ রূপটাই সাহিত্যের ক্যানভাসে উঠে আসে—এটাই পূর্ণ যৌবনা নারীর 'হকের কথা', যা কবিদের হাতে বানীরূপ পেয়েছে।

'গোলাহাট পালায়' দেখি পার্বতী শিবকেও তার চরিত্রের সততা সম্পর্কে তীব্র ব্যঙ্গ করে দিচ্ছে সুযোগ বুঝে—

"এই তত্ত্ব জানিতে যাও কুচনী পাড়ায়।।
বুড়া ছেড়ে যুবা হও পেলে যার সঙ্গ।
সেইখানে এই কথা উচিত প্রসঙ্গ।"[২১]

এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ব্যভিচারকে তীব্র নিন্দা করছে এক নারী, কিন্তু তার কথা মাত্র সার কাজের কাজ কিছুই হয় না, এটি একটি বিফল নারীর আস্ফালন মাত্র। 'কানড়ার স্বয়ম্বর পালা'-য় দেখি লাউসেনের সঙ্গে কানড়ার বিবাহ উপলক্ষ্যে কানড়া প্রশ্ন তুলছে বুড়ো বর করবার বিরুদ্ধে, "তবে কেনে বুড়া পতি ঘটাইলে মা।" অর্থাৎ নারীমন কোথাও যেন তাদের প্রচলিত খোলশ ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা দেখি পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও তাদের বীরত্ব দেখিয়েছে। সে সময়ে রমণীরাও যে যুদ্ধে পারদর্শী ছিল তার প্রমাণ কানাড়া। শিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়া যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিনী বীর্যবর্তী রমণী। কেননা তার পিতৃ রাজ্য আক্রান্ত হলে সে যুদ্ধারোহণে স্বয়ং সৈন্য চালনা করছে। নারীর অবিচল প্রেম ও নিষ্ঠা পারিবারিক জীবনের প্রতি মমত্ববোধ এবং বীরত্ব ও চরিত্রের দৃঢ়তা মিলে কানাড়া চরিত্রটি এক দীপ্তিময় প্রতিভায় চমকিত। রাঢ়ের রমণীদের এই জাতীয় বীরত্ব সমকালীন সমাজে নারীর অবস্থানটি বিশেষিত করে তোলে। কানুডোমের পত্নী লখাইর বীরত্ব 'ধর্মমঙ্গল'-এ চিত্রিত হয়েছে। এই বীরাঙ্গনা তার নিষ্ঠা, স্নেহশীলতা, কর্তব্যবোধ, সূক্ষ্ম বিচার তীক্ষ্ণতাবোধ অসাধারণ ধৈর্য্য ও বিবেচনাবোধের জন্য বাংলা সাহিত্যে এক স্বতন্ত্র স্থান করে নিয়েছে। লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করলে লখাই নগর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ত্যজ জীবনের নারীরা পুরুষদের হস্তবন্দি হয়ে থাকেনি, নিজস্ব নারীত্বের গুণে নারীত্বের স্বতন্ত্রতাকে প্রকাশ করেছে। তবে নারী বলে এরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা অর্জন করতে পারেনি, কোথাও যেন পুরুষতন্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে এরা আবদ্ধ। আমরা দেখি, কর্পূর ও সনকা দুই সতীন প্রচলিত বহু বিবাহ প্রথার শিকার। এই দুই সতীনের মধ্যে মন কষাকষি ও তাদের জীবনের কারুণ্য তা এই পুরুষতন্ত্রের শিকার। অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ চিত্রে নারীর অবস্থান হিসাবে আমরা বলতে পারি তখনও নারীদেরকে সমাজের চাপে সহমরণে যেতে হতো। কর্ণসেনের ছয় পুত্রের মৃত্যুতে ছয় বধূর সহমরণে যাবার

কথা পাই, 'চিতানলে ছয় বধূ হৈল অনুমৃতা।' অর্থাৎ এই যে সহমরণ প্রথা এর কোনো যুক্তি না থাকলেও, যেহেতু সমাজ ছিল পুরুষনিয়ন্ত্রিত তাই তাদের চাপে পড়ে সহমরণে যেতে বাধ্য হত নারীরা, এতে কোনো বিদ্রোহের ভাষা খুঁজে পায়নি নারীরা।

আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর রামেশ্বরের 'শিবায়ন' ও ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল-এ' দেখলাম তৎকালীন নারীর অবস্থানটি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে নারীর কোথাও যেন মন থেকে মেনে নিতে পারছে না বলে তাদের ভাষা ভঙ্গীতে বিদ্রোহের ভাব-প্রকাশ লক্ষ্য করতে পারছি। পুরুষতন্ত্র ও লিঙ্গ বৈষম্যকে অস্বীকার করে স্বতোপ্রণোদিত হচ্ছে এই অষ্টাদশ শতকের নারীর। ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' ও রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যের আধারে অষ্টাদশ শতাব্দীর নারীজীবনের পরিচয় পেলাম। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে নারীগণের পতিনিন্দা সূত্রে অষ্টাদশ শতকের নারী জীবনকে। ধর্মমঙ্গলের 'নারীগণের পতিনিন্দা' বা 'শিবায়ন' কাব্যে 'শাশুড়ীদের জামাই নিন্দা' বা বিক্ষিপ্তভাবে গৌরীর শিবনিন্দা দেখতে পেলাম সেখানে পতিদের বা জামাইদেরকে নিন্দা করা হয়েছে যে ভাষায় 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের 'নারীগণের পতিনিন্দা'র ভাষা আরও তীব্র এবং তারা খোলাখুলি ভাবে তাদের পতিদেরকে নিন্দা করছে। এখানে পতিনিন্দায় মুখর নারীরা সকলেই স্পষ্টবাচনে কামের অধিকার দাবী করে। এই সকল চিত্রগুলি কিন্তু কোনোটাই সমাজ বহির্ভূত কাম সম্পর্কের ভোক্তা নয়, প্রত্যেকটি সম্পর্কই দাম্পত্য গণ্ডীর মধ্যে সুরক্ষিত। নারীগণের পতিনিন্দায় পতিদের অঙ্গহানির বর্ণনা সেখানে নিছক কৌতুককর বর্ণনা হয়ে থাকেনি, যৌবনবতী স্ত্রীর অতৃপ্ত যৌনচেতনাকে বলতে শিখিয়েছে।

ভারতচন্দ্র রায়ের 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে নারীগণের পতিনিন্দায় মোট একুশটি রমণীর মধ্যে স্পষ্টত তিনটি শ্রেণি রয়েছে। প্রথম শ্রেণিতে ৫টি রমণীর আক্ষেপ, তাদের কুরূপ ও অঙ্গহানির কারণে তাদের যৌবন যাপনে অতৃপ্ত। দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে চোদ্দটি রমণী, যারা পতিদের ব্যস্ততার কারণে স্বামী সঙ্গ থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত। আর তৃতীয় শ্রেণিতে রয়েছে মাত্র দুটি রমণীর কথা, যারা হিন্দু সমাজের বিচিত্র কৌলীন্য প্রথার চাপে যথাক্রমে নাবালক ও প্রায় শ্মশান যাত্রী স্বামীর স্ত্রী বলে তাদের যৌবন উপবাসিত। এছাড়া আরেক নারী তার পতিনিন্দা করছে যে 'সতী' বলে পরিচিত—

এক রামা বলে সই শুন মোর দুখ।'
আমারে মিলিল পতি কালা কালামুখ।,।
সাধ করে শিখিলাম কাব্যরস যত।
কালার কপালে পড়ি সব হৈল হত।।"[২২]

এখানে রমণী তার কালা পতির ভাগ্যে পড়ে ভাগ্যাহত হয়ে পতির নিন্দা করছে। সেকালে মেয়েদের বাইরে লেখাপড়ার সুযোগ ছিল না। ঘরের মধ্যেই লেখাপড়া করতে হত সুতরাং সেই আয়াস সাধ্য পড়াশোনার পড় 'কালা' স্বামী প্রাপ্তিতে যে অবরুদ্ধ ক্রন্দন তা স্বতোৎসারিত, ভারতচন্দ্র সমাজ বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন বলে এই নারীর মুখে যথার্থ ভাষা দিয়েছেন। বলা যায় এই অংশ থেকে নারীশিক্ষা ও তাদের সামাজিক অবস্থার পরিচয়টিও উঠে এসেছে—

"আর রামা বলে সই এও বরংসুখ।
মোর দুখ শুনিলে পলাবে তোর দুখ।।
মন্দভাগা অন্ধপতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল।।
ভরা পূরা যৌবন উদাসে বাসি শূন্য।
আঁধলারে দেখাইলে নাহি পাপ পূণ্য।"[২৩]

নারীর মনে বাসনা মাত্র থাকে যে, তারা রূপ-যৌবন, সাজ-সজ্জা, সব তার পতির সামনে তুলে ধরবে, কিন্তু এই নারীর সে উপায় তো নেই, হয়তো কুল রক্ষার জন্য বাধ্য হয়েছে অন্য পাত্রকে বিয়ে করতে। একদিকে যেমন নিজের রূপ যৌবন নিজ পতির সামনে তুলে ধরতে পারছে না, অন্যদিকে তেমনি এর পতি সামাজিক ভাবে অসুস্থতার কাম জন্য ক্ষুধা মেটাতে অক্ষম হচ্ছে বলে এই নারী আক্ষেপ করছে—

"আর রামা বলে সই এ মাথার চূড়া।
আমি এই যূবতী আমার পতি বুড়া।।
বদনে রদন লড়ে অদনে বঞ্চিত।
সে মুখ চুম্বনে সুখ না হয় কিঞ্চিত।।"[২৪]

'এটাতো পূর্ণ যৌবনা নারীর হকের কথা।'[২৫] এই রমণী তার স্বামীর কাছ থেকে যৌনসুখে উপবাসী। আসলে এর মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ জীবনের একটি জীবন্ত চিত্র ফুটে উঠেছে। অসম বিবাহ দাম্পত্য জীবনে যে কি সুগভীর দুঃখের কারণ হয়, তার প্রতি ভারতচন্দ্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপ করেছেন—

'আর রামা বলে বুড়া মাথার ঠাকুর।
মোর দুঃখ শুনি তোর দুঃখ যাবে দূর।।
কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটা সোটা মোর পতি বড় ভুড়ো পেট।।
অন্যের শুনিয়া সুখ দুঃখে পোড়ে মন।
একবার নহে কভু চুম্ব আলিঙ্গন।।"[২৬]

পরের নারীর ক্ষেত্রেও ঠিক একই দুর্ভাগ্য, সে বলে—

"আর রামা বলে ইথে না বলিহ মন্দ।
না চাপিতে চাও পাও এ বড় আনন্দ।।
বামন বঙ্খুর পতি কৈতে লাজ পায়।
তপসিয়া নাহি পাই কোলেতে লুকায়।"[২৭]

এই দুটি নারীর পতি যথাক্রমে শারীরিকভাবে স্থূল ও বেঁটে, ফলে তাদের ঘরণীর যৌনাকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করার ক্ষমতা তাদের নেই, একজনের পতি অক্ষম হলেও চেষ্টা করে, কিন্তু অপর নারীর পতি 'কৈতে লাজ পায়'। এই নারীগুলির আক্ষেপ তাদের পতির কুরূপ ও অঙ্গহানির কারণে তাদের যৌবন অতৃপ্ত। যৌন অতৃপ্তির কারণে এরা নিজেদের অবস্থান থেকে বেরিয়ে এসে 'সুন্দরের রূপের সঙ্গে তুলনা করে, তাদের স্বামীদের কুরূপ, কদর্য ও শারীরিক অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করছে, কোথাও নারী তার আপন সত্তাকে খুঁজে পাচ্ছে। পুরুষের স্থূল, গলিত গন্ধ রূপটিকে তুলে ধরছে।

এরপর আমরা যে কয়েকজন নারীকে পাই তাদের স্বামীরা কোনো না কোনো ভাবে ব্যস্ত। এই ব্যস্ততার কারণে স্বামীসঙ্গে থেকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত হওয়ার জন্য নারীরা তাদের পতিদেরকে নিন্দা করেছে, আর নারীদের এই পতিনিন্দায় এই মূল্যবোধহীন, অবক্ষয়িত সমাজকে তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে সমালোচনা করতেও ভোলেননি কবি। এই সব 'পতি'রা কেউ কেউ রাজসভাসদ-বৈদ্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত-গণক মুন্‌শী-বখশী-উকীল- খাজাঞ্চি ঘড়িয়াল। সভা বর্ণনার সময় এদের আমরা পেয়েছিলাম শুধু নামে আর বৃত্তির পরিচয়ে, সেখানে কোনো বিরূপতা ছিল না। কিন্তু গোল বাধল তাদের পত্নীদের কথায়। রাজসভার নিয়ম তাদের জন্য খাটে না, সুযোগ পেয়ে তারা অনাবৃত করেছে স্বামীর কর্মবৃত্তি এবং জীবনাচরণের অসংগতিকে। এর মধ্যে দিয়ে যেমন তৎকালীন সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে, তেমনি পাশাপাশি তাদের জীবনাচরণের অসংগতি ও নারীদের অতৃপ্ত কামের কথা ফুটে ওঠে—

"রাজসভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে।।
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কাম জ্বরে সে বলে উল্বণ।।"[২৮]

অন্যের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন জায়গায় এই পুরুষটি বেড়ায় অর্থ উপার্জনের জন্য, সে তার সংসারের প্রতি উদাসীন। তার স্ত্রী কামের ক্ষুধায় যখন কাঁপতে থাকে, তখন তাকে রোগ বলে ঔষুধ দেয়, এখানে নারীর স্বাভাবিক যে জৈবিক চাহিদা তা থেকে বিচ্যুত হচ্ছে কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ সে খোঁজ খবর রাখে না, কে বলতে পারে যে, এই পুরুষ অন্য নারীর প্রতি আসক্ত নয়, অন্য নারীর প্রতি আসক্ত হবার ফলেই হয়তো ঘরে নিজ স্ত্রীর জৈবিক চাহিদাকে মেটায় না। এখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর যে অসহায়তা তার চিত্রই ফুটে উঠেছে। আবার এই নারীর উক্তিতে অবক্ষয়িত সমাজের চিত্রও ফুটে উঠেছে। এই যুগে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত 'না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত' গণক 'বারবেলা কালবেলা সদা সঙ্গ তার।।' উকিল তার স্ত্রীর চোখে—

উকীল আমার পতি কিল খেতে দড়।
স্ত্রীলোকের মত পড়ি মারি খেতে পারে।
সব গুণ যত দোষ মিথ্যা কয়ে রাখে।"[২৯]

উকীলের স্ত্রী তার স্বামীর এই চারিত্রিক স্খলন ও কর্মের যথার্থ পথ অবলম্বন না করার জন্য নিন্দা করছে। অন্য নারী বলছে : "পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোরপতি।/দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি।"[৩০] এর কাছে কর্মই সব। সংসারে উদাসীন থাকার জন্য এর স্ত্রী 'রতি' থেকে বঞ্চিত। খাঁজাঞ্চিপত্নী বলছে—

"খাঁজাঞ্চি আমার পতি সবারি অধম।।
চাঁদমুখো টাকা দেই সোনা মুখে লয়।
গণি দিতে ছাই মুখো অধোমুখ হয়।"[৩১]

"কহে আর রসবতী গালভরা পান।

পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান।"[৩২]

এরা এদের স্বামীর কৃপণতার জন্য নিন্দা করছে, এদের দুজনেরই দুঃখের মাত্রা এক, পতিরা হল কৃপণ এদের কাছে কিছু পেতে গেলে খুব কসরত করতে হয়। ঘড়েল পত্নীর ক্ষোভ পুরোপুরি তার যৌনক্ষুধা না মেটার জন্য, তার স্বামী নিজে অক্ষম—

রাত নাহি পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায়।"[৩৩]

এরা এদের স্বামীর কৃপণতার জন্য নিন্দা করছে, এদের দুজনেরই দুঃখের মাত্রা এক, পতিরা হল কৃপণ, এদের কাছে কিছু পেতে গেলে খুব কসরত করতে হয়। ঘড়েল পত্নীর ক্ষোভ পুরোপুরি তার যৌনক্ষুধা না মেটার জন্য, তার স্বামী নিজে অক্ষম—

"রাত নাহি পোহাইতে দুঘড়ি বাজায়।
আপনি না পারে আরো বন্ধুরে খেদায়।"[৩৩]

বৃত্তিজনিত সঙ্কটের এ এক ভয়াবহ চিত্র, যা নির্মম রসিকতা মনে হলেও এটি রসিকতা মাত্রই নয় এর মধ্যে ফুটে উঠেছে এক বিশেষ ধরনের সাংসারিক সামাজিক চিত্র। যার মধ্যে ফুটে উঠেছে সংসার জীবন ও কর্মজীবনের দ্বন্দ্ব এবং এই দ্বন্দ্বে বলী হচ্ছে নারীই। পূর্বে দেখেছি বহুবিবাহ প্রথার একটি রূপ হল কৌলীন্য প্রথা। এই প্রথা মধ্যযুগীয় বাঙালি সমাজের একটি গভীর ক্ষত স্বরূপ। কৌলীন্য প্রথায় কুল রক্ষার জন্য বাবা-মা বুড়ো বরের সঙ্গে বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত বোধ করত না। এই অসম বিবাহের ফলে দাম্পত্য জীবন যে গভীর দুঃখের কারণ হয়ে উঠত ভারতচন্দ্র খুব তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সাহায্যে আমাদেরকে দেখিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেখতে পাই এক কুলীন কন্যার বিবাহ হয়েছে তার চেয়ে বয়সে ছোট এক যুবকের সঙ্গে—

"আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে।।
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই।।"[৩৪]

কৌলীন্য প্রথার ফলে যুবতীদেরকে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করতে হত বর পাবার জন্য; কারণ কুলীন পুত্র মেলাই ভার। এখানে দেখছি কুল রক্ষার জন্য অসম বর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে এই রমণী; অন্যদিকে কৌলীন্য প্রথা মধ্যযুগের কোনো কোনো কুলীন সন্তানকে এক নতুন ধরণের জীবিকা গ্রহণের পথ খুঁজে দিয়েছিল। তারা বিবাহ করত অনেক, এক এক জনের পঞ্চাশ-ষাট জন স্ত্রী থাকত, খাতায় নাম লিখে রাখত তারা। যখনই টাকার প্রয়োজন পড়ত, তারা শ্বশুর বাড়ির দ্বারে গিয়ে হাজির হত। স্ত্রীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেওয়া তো দূরের কথা, সেই সমস্ত অভাগিনীদের উপার্জিত অর্থ আত্মসাৎ করে এরা বিদায় নিত। এক নারী বলে—

"দু-চারি বৎসরে যদি আসে একবার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার।।
সুতাবেচা কড়ি যদি দিতে পারিতায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায়।।"[৩৫]

কৌলীন্য প্রথার সুযোগ নিয়ে নারীর উপর পুরুষের এই অন্যায় অর্থনৈতিক শোষণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজ জীবনেরই চিত্র এবং ভারতচন্দ্র এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে নারীকণ্ঠে ভাষা দিয়েছেন। কুলীন প্রথা সমাজকে এতটাই দূষিত করে তুলেছিল যে, ১৭৫২-৫৩ তে দাঁড়িয়ে ভারতচন্দ্র যেভাবে কৌলীন্য প্রথার ভয়াবহ রূপটিকে চিত্রিত করেছেন এর প্রায় একশো বছর পর (১৮৫৪) আমরা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব'তে সেই একই ভয়াবহতা দেখতে পাব। সেখানেও দেখব—'যৌবন বহিয়া গেলে বিবাহ বিধান।'[৩৬] কুলীন বর টাকা পাবে তবেই ঘরে প্রবেশ করবে। আসলে ভারতচন্দ্র এই নারীর বক্তব্য শুধু ব্যঙ্গই করেন নি ফুটিয়ে তুলেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর সমাজ সত্যকে। অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু যথার্থই বলেছেন, "বাঙালা পুরুষ জাতির পক্ষে এরকম মারাত্মক অধ্যায় ভারতচন্দ্র অল্পই লিখেছেন। অশ্লীলতার জন্য মারাত্মক নয়, মারাত্মক সত্য দর্শনের জন্য।"[৩৭] 'এ সবার দুঃখ শুনে এক সতী' বলে ওঠে "অপূর্ব আমার দুঃখ" পৃথক শব্দ যোজনের জন্য সে আলাদা হয়ে যায় অন্যদের থেকে। তার এ দুঃখ সত্যিই অপূর্ব—

"মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।।
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু।।"[৩৮]

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই ভাগীরথীর দুই তীরে গড়ে উঠতে থাকে বণিক নগরী। অন্নদামঙ্গলের প্রথম খণ্ড থেকে দ্বিতীয় খণ্ডে পৌঁছালে অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবনের এই পরিবর্তনের ছবিটি স্পষ্ট হয়। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্র ধীরে ধীরে অবসিত হচ্ছে, পুঁজিবাদের জন্ম হচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে নগরে যাচ্ছে মানুষ অতিরিক্ত মুনাফার লোভে; বিদেশি বণিক সঙ্গে কারবার করে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছে। আর্থ-সামাজিক এই পরিবর্তন এবং দেশজোড়া রাজনৈতিক অরাজকতা মানুষের চেতনাকেও প্রভাবিত করে। বহির্জগতে যদি এভাবে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দোলচালতা চলতে থাকে তাহলে মানুষের মনের জগৎও কিছুটা এর দ্বারা প্রভাবিত হবে। আর এটাই হল জীবনের সংকট। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক দৈন্যটাই ফুটেছে কবি পত্নীর কথায়। ভারতচন্দ্র সমাজ সচেতন কবি ছিলেন বলে সমাজের এই স্বামী নামক ক্লীব, অর্থলোভী, বিকৃত কাম মানুষগুলির প্রতি শ্রদ্ধাহীন ব্যঙ্গে নারী সমাজের ধিক্কার তিরস্কার প্রকাশ করেছেন। সমালোচক বলছেন—

"নারীগণের পতিনিন্দার মধ্যে দিয়ে ভারতচন্দ্র অসম মিলনের অতৃপ্তি ও নৈরাশ্যের প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। ...ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিবাহিত জীবনে দাম্পত্য সুখ-হীন কতকগুলি নারীর মনের জ্বালার রূপ। পুরুষতান্ত্রিক এদেশের সমাজ, পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ ও নারীর ক্ষেত্রে একবিবাহ (বৈধব্য ঘটলেও), এবং প্রায়শঃ বাল্যবিবাহ— এসব ক্ষেত্রে নিপীড়িত কামনার যে রুদ্ধ ক্রন্দনকে প্রতিক্ষণে নারীরা বহন করে, তাকেই কিছুটা মুক্তির সুযোগ দিয়েছেন ভারতচন্দ্র।"[৩৯]

'বিদ্যাসুন্দর' খণ্ডের এতদূর পর্যন্ত (নারীগণের পতিনিন্দার আগে পর্যন্ত) রঙ্গরসের ভাড়ামী ও ভোগের উচ্ছলতাই চলছিল, কিন্তু কবি নারীগণের 'পতিনিন্দা' অংশে এসে এমন জায়গায় পৌঁছালেন যেখানে, কবির বর্ণনায় "ভোগেচ্ছা ও ভোগাশ্রয়ের

শোচনীয় অসামঞ্জস্যের যাতনা তলে তলে অশ্রুরেখাকে টেনে গেছে।"[৪০] 'নারীগণের পতিনিন্দা'-র মাধ্যমে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের বঞ্চনা ও অবমাননার ছবিটিকে তুলে ধরেছেন। তারা তাদের জীবনভোগের বাধা স্বরূপ পুরুষদের স্থূল অসংগতিগুলিকে তুলে ধরছে। তাদের মনে দীর্ঘদিনের জমে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে নিজ নিজ পতিদের অসংগতিগুলিকে তুলে ধরছে এর ফলে পতিনিন্দার পাশাপাশি সমাজকেও নিন্দা করছে, তাদের অবস্থান থেকে। 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশ ছাড়াও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত ভাবে নারীরা পতিদের নিন্দা করছে যেমন 'শারিশুক বিবাহ ও পুনর্বিবাহ' অংশে বিদ্যা সুন্দরকে প্রতিশোধের ছলে ধিক্কার জানাচ্ছে। আমরা এর মধ্যে বিদ্যার প্রতিশোধ স্পৃহাকে লক্ষ্য করি। কারণ এর আগে 'দিবাবিহার ও মানভঙ্গ' অংশে দেখি বিদ্যার নিদ্রাকালে সুন্দর তার সঙ্গে বিহার করে বিদ্যাকে অপমান করেছে। বিদ্যার ভাষায়—

'দিবসে নিদ্রার ঘোরে আলু থালু পেয়ে মোরে
এ কর্ম্ম কেবল অপমান।"[৪১]

বিদ্যা তার প্রিয়কৃত অপমানকে মেনে নিতে পারে না, তার অবমাননার প্রতিফল নিতেই বিদ্যা সুন্দরকে ধিক্কার করছে। বিদ্যার এই ভাষণের মধ্যে তৎকালীন পুরুষের চরিত্র স্খলনের ছবি পাই। পুরুষেরা তাদের কামক্ষুধাকে মেটানোর জন্য বহু নারীর সংসর্গ লাভ করত; পরোক্ষভাবে বিদ্যা যেন এই ব্যবস্থাকেই বিদ্রোহ করছে, ধিক্কার জানাচ্ছে। আবার পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের বহুনারীর সংসর্গকে দেবী গৌরীও নিন্দা করছে তীক্ষ্ণ ভাষায় শিবকে বলছে—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সহমৃতা হলেও স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী দ্বিতীয় নারীকে বরণ করে নেয় তার জীবনে দাম্পত্য জীবনকে বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করাতেই স্ত্রী তার জীবনকে সার্থক বলে মনে করে। স্বামী কিন্তু সেইরকম কোনো সংস্কারই মানে না। এখানে কুচনী বাড়ি যাবার জন্য গৌরী শিবকে খোঁটা দিতেও ছাড়েনি। এতে যেমন চিত্রিত হয় তৎকালীন সহমরণ প্রথা, যেখানে নারীকে সমাজের অবাধ্য হলে চলত না, তেমনি পুরুষের চরিত্রের স্থূল রূপটিও ফুটে ওঠে।

দারিদ্র্যের আস্ফালনে নারী জীবনে কোনো সুখ ছিল না, সতীন নিয়ে তাকে ঘর করতে হত। 'রাজার বিদ্যাগর্ভ শ্রবণ', অংশে আমরা দেখি রাণী বলছেন—

"ঘরে আইবড় মেয়ে কখন না দেখ চেয়ে
বিবাহের না ভাব উপায়।"[৪৩]

এর মধ্যে দিয়ে অষ্টাদশ শতকের নারীর অসহায় চিত্রটি ফুটে ওঠে। ঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকলেও পিতার কোনো চেষ্টাই নেই তাকে বিবাহ দেবার। রাণী বলেন—

"বিদ্যার কি দেব দোষ তারে বৃথা করি রোষ
বিয়া হৈলে হৈত কত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বালা
কথায় রাখিব কত টেলে।"[৪৪]

বিদ্যা তার কামের জ্বালা মেটানোর জন্যই একাজ করেছে; বিদ্যা বন্ধনকে অস্বীকার করেছে। সে নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিজের আকাঙ্ক্ষা নিজেই পূর্ণ করেছে। অষ্টাদশ

শতকের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে নারীর এই নির্মোহ উদ্ধার আমাদের মুগ্ধ করে দেয়। বলা ভালো "নারীগণের পতিনিন্দা মঙ্গল কাব্যের কোনো কৌতুককর বর্ণনা নয়; নারীর স্বতঃপ্রণোদিত বিদ্রোহ।"[৪৫] 'নারীগণের পতিনিন্দা' অংশে নারীকে যেভাবে কবি তুলে ধরেছেন তা মধ্যযুগীয় ভাবনায় অনেক অগ্রণী।

মঙ্গল কাব্যগুলির উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ জনসমাজকে আকৃষ্ট করা। এটি অর্ধ মৌখিক সাহিত্য : আসরে গাওয়া হত এবং সাধারণত কাব্যে বন্দিত দেবতার উৎসবেই গাওয়া হত। এই কারণে হয়তো মধ্যযুগের সাধারণ বাঙালি গ্রামবাসীদের রুচি এবং মনোভাবের প্রকাশ পাওয়া যায় এই সাহিত্যে। মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় তা হল পতিনিন্দা; যেখানে আছে হিন্দু সমাজের পতিব্রতা নারীর সম্পূর্ণ রূপের প্রতিচ্ছবি। মধ্যযুগীয় সমাজে একজন হিন্দু রমণী কখনোই অপরিচিত ব্যক্তির রূপের প্রশংসা করে না, বা জনসম্মুখে স্বামীকে ছোট করে না। সে তার স্বামীকে দেবতা রূপে পূজা করে এবং তাকেই ভাগ্য রূপে স্বীকার করে নেয়। প্রবল ভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজে পতিনিন্দার মাধ্যমে পুরুষজাতির প্রতি ঘৃণার কথা এত স্বচ্ছন্দে প্রকাশিত হয় যে তা কখনো কখনো যন্ত্রণাক্লিষ্ট স্ত্রীদের মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। এই সকল কারণে কিছু ধর্মপ্রাণ কবি 'পতিনিন্দা' বিষয়টি অপছন্দ করেছেন। 'দ্বিজমাধব' পতিনিন্দায় চিরাচরিত অনুযোগগুলি খুব সংক্ষেপ করে এই ধরনের উপসংহার টেনেছেন—

"সত্যবতী বলে তোরা বড় দুষ্টমতী।
ইহলোকে পরলোকে পতিত্রাণা গতি।।
তারি অবধিয়া বলা তোরে না শুধায়ে।
নিন্দিলে পতিরে পত্নী আধোগতি পায়ে।।"[৪৬]

দ্বিজমাধবের ব্যক্তিগত অপছন্দ থাকা সত্ত্বেও পতিনিন্দা বিষয়টি তাঁর কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। (যদিও তাঁরটি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত) কারণ এর পিছনে ছিল দর্শক বা শ্রোতার চাহিদা এবং দাবী। দর্শকের 'পতিনিন্দা' সম্পর্কে প্রত্যাশা পরিপূর্ণ করতে তিনি অনিচ্ছাকৃত ভাবেই একটি পতিনিন্দার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর কাব্যধারার পরবর্তী কবিতা পতিনিন্দার বিস্তৃত বর্ণনা দিতে পারত, এই বিষয়টির প্রতি অনুরাগ থাকলে। কিন্তু মুকুন্দ মিশ্রও তাঁর 'বাশুলিমঙ্গল' কাব্যে পতিনিন্দা সম্পর্কে ধারণা দ্বিজমাধবের মতোই ছিল। ফলে তিনি একটি দীর্ঘ বর্ণনায় স্ত্রীদের পতি-অনুরাগী হতে বলেছেন। এই মনোভাব কাজ করার ফলেই কিছু কিছু মঙ্গল কাব্যে বিশেষত পরবর্তী লেখক যথা রামানন্দ যতি এবং দ্বিজ রামদেবের চণ্ডীমঙ্গলে পতিনিন্দার কোনো উল্লেখ নেই। 'পতিনিন্দা' কোনোভাবেই কোনো একজন কবির উদ্ভাবন নয়। বাংলায় মঙ্গল কাব্যের প্রচলিত আঙ্গিকের মধ্যেই পতিনিন্দার বিস্তার। সাল তারিখের হিসেবে নির্দিষ্ট হয়ে না বলতে পারলেও অনুমান করা হয় বিপ্রদাসের 'মনসাবিজয়' কাব্যেই পতিনিন্দার প্রথম প্রকাশ। পরবর্তীকালে দ্বিজমাধব, মুকুন্দের কাব্যে পতিনিন্দার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'পতিনিন্দা'র উৎসের খোঁজ পাওয়া যায় সুদূর পঞ্চদশ শতাব্দীতেও। 'পতিনিন্দা' যেহেতু বিবাহ বাসরে গাওয়া হতো এজন্য ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পতিনিন্দার উৎপত্তি লুকিয়ে আছে বিবাহ বাসরে গাওয়া কর্কশ ছড়া বা Doggred এর

মধ্যে। একটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া দুই শতাব্দী বিস্তৃত পতিনিন্দার তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। ব্যতিক্রমটি হল ভারতচন্দ্র রায় এবং তাঁর 'বিদ্যাসুন্দর'। যেখানে সংক্ষিপ্ত ঘরোয়া পতিনিন্দা একটি উচ্চশৈল্পিক আবেদন সৃষ্টি করে। যা এক পৃথক বিষয় হয়ে কাব্য বিষয়ের ভাবরূপ যেমন বদলে দেয়, ঠিক তেমনই তৎকালীন সমাজের নারীচেতনার দিকটিও বিস্তৃত ভাবে তুলে ধরে।

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' বিদ্যা এবং সুন্দরের গোপন প্রণয়োপাখ্যান। বিদ্যা গর্ভবতী হয়ে পড়লে তা লোক সম্মুখে এসে পড়ে। রাজরক্ষীরা বিদ্যার কক্ষে সুন্দর কৃত সুরঙ্গটি আবিষ্কার করে, তাকে বন্দী করে হাত কড়া পরিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করায়। এই সময় কুলবতীরা সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করে তার রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে সুন্দরের মাপে যাচাই করে নেয় তাদের গৃহস্থ পতিদেবতাদের। যারা সুন্দরের তুলনায় নিকৃষ্ট। বিচারের কালে তারা নিজ পতিপক্ষে রায় দিতে পারেন নি। উল্লেখ্য পতিনিন্দা 'বিদ্যাসুন্দর' বা 'কালিকামঙ্গল'-কাব্যের চিরাচরিত বিষয় নয়। কারণ আমরা অন্যান্য বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম, গোবিন্দ দাস, রামপ্রসাদ, দ্বিজ রাধাকান্ত এবং মধুসূদন চক্রবর্তীর কাব্যে দেখি পতিনিন্দার উল্লেখ নেই। এই সব কবিদের বর্ণনায় দেখি রমণীরা সুন্দরের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করে এবং সেখানেই থেমে যায়।

ভারতচন্দ্র তাঁর রচনায় 'নারীগণের পতিনিন্দা'টি চিরাচরিত ভাবেই শুরু করেছিলেন। আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তবুও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নারীমনের এক স্বতন্ত্র রূপ ভারতচন্দ্র তুলে ধরেছেন এই অংশে। এখানে রমণীরা সকলেই স্পষ্ট বাচনে কামের অধিকার দাবী করে। এদের কামের অধিকারের দাবী সমাজ অননুমোদিত কাম সম্পর্কের দাবী নয়। এর প্রত্যেকটি সম্পর্কই দাম্পত্যে সুরক্ষিত। নারীগণের পতিনিন্দায় পতিদের অঙ্গহানির বর্ণনা এখানে হাস্যরসের যোগানদার না হয়ে যৌবনবতী স্ত্রীর অতৃপ্ত যৌনচেতনাকে উস্‌কে দিয়েছে। ভারতচন্দ্রের নারীগণের পতিনিন্দা কোনো কৌতুককর বর্ণনা নয়, নারীর স্বতঃপ্রণোদিত বিদ্রোহ। রমণীরা গলিত রূপগুলিকেই ফুটিয়ে তুলছে। তারা তাদের 'পূর্ণযৌবনা নারীর হকের কথা' বলছে।

আলোচনার প্রয়োজনে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে কাব্যের নায়িকা বিদ্যা এই উপাখ্যানে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী মাত্র হয়ে থাকেন নি, তিনি নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিজের আকাঙ্ক্ষা নিজেই পূর্ণ করছেন। সেই উপাখ্যানেই রমণীরা 'পতিনিন্দা' অংশে নিজেদের হকের কথা নিজেরাই উচ্চারণ করেছে। স্বীকার করতে বাধা নেই; যে মধ্যযুগের ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে ভারতচন্দ্র নারীভাষার যেন এক স্বতন্ত্র উপলব্ধি আপন কবিসত্তায় খুঁজে পেয়েছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কৌলীন্য প্রথা শাসিত সমাজে নারীর নির্মম যন্ত্রণার সাংসারিক সামাজিক দৃষ্টির পরিচয় দিয়ে ভারতচন্দ্র ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক মানবতাবাদের ভাষ্য রচনা করেছেন এই পতিনিন্দা অংশে। সমালোচকের মতে—

> "আসলে দেব কথার প্রথানুগত্য থাকলেও রায়গুণাকরের কাছে এই জগৎ, এই বাস্তবজীবনই ছিল সবচেয়ে বড় সত্যি। একে ছাড়িয়ে কোনও ঊর্ধ্বলোকের দিকে পাড়ি দেতে যান নি তিনি।"[২] মানুষের উত্থান পতন দেখেছিলেন যে কবি আবার

নিজের জীবনটাকেও অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে মানুষ, তিনি তো সহজেই জীবনটাকে দেখতে পারবেন খোলা চোখে তাই "উনিশ শতকীয় সাম্যবোধ, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ বা Individualism-এর পিছনে পাশ্চাত্য প্রভাব প্রত্যক্ষত কাজ করলেও রেনেসীয় বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে তা যে সুষ্ঠু সংগতি লাভ করেছিল, তার কারণ অবশ্যই এই বিগত শতক-বাহিত ব্যক্তিমানুষাশ্রয়ী ধর্মবোধ।"[৪৭]

বলাবাহুল্য বিগত শতকের এই গান শুনিয়েছিলেন ভারতচন্দ্র। তাঁর কাব্যে যে ধর্মের আবরণ ছিল তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি চৈতন্যের আত্মপ্রকাশ, মানবিকতাবোধ এবং নারীভাষার সুর বেজেছিল একটু জোরালো ভাবেই। আর সেই উনিশ শতকীয় সাহিত্যে আধুনিকতার সূচিমুখ ভারতচন্দ্রের মধ্য দিয়েই প্রতিধ্বনিত হল। সমালোচক অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

"ব্যক্তিভাবপ্রধান গীতিকবিতার রূপ ও রস আধুনিককালের ব্যাপার। দেব ভাবপ্রধান মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি নিষ্ঠ গীতিকবিতার ততটা প্রচলন না হইবারই সম্ভাবনা। কিন্তু ভারতচন্দ্র আপনার অজ্ঞাতসারে ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার পথ খনন করিয়া গিয়াছেন।"

ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে প্রেমের এক নতুন জগত নির্মাণ করলেন যা পরবর্তীকালের কবিদের প্রভাবিত করল। ভারতচন্দ্রের পূর্ব-প্রেমের জগত ছিল সম্পূর্ণতই দেবাশ্রয়ী; 'বিদ্যাসুন্দর' অংশ বা 'পতিনিন্দা'-র লৌকিক জগত যেন আধুনিক বাংলা কবিতায় লৌকিক জগতে হাসিকান্নার সুখটিকেই এনে দিতে সাহায্য করেছিল। নিধুবাবুর যে টপ্পা বা গোপাল উড়ের যোগান, গীতিসুরের যে প্রাধান্য তার বীজ লুকিয়েছিল ভারতন্দ্রের মধ্যেই। উল্লেখ্য ভারতচন্দ্রের এই কাব্য প্রতিভাতে আকৃষ্ট হয়ে পতিনিন্দার মূল অংশ 'বিদ্যাসুন্দর' নিয়ে যাত্রা, গীতিনাট্য, লোকাভিনয় একসময় বাংলা রঙ্গমঞ্চকে পূর্ণ করে রাখত। ভারতচন্দ্রের লেখনীতে যে জীবনভাবনা তা উনিশ শতকের বাংলার যাত্রা-নাটক গীতাভিনয়ের পাশাপাশি কাব্যজগতকেও নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী ১৮০৬ খ্রিঃ অন্নদামঙ্গলের অনুসরণে রচনা করেন 'গৌরীমঙ্গল' ভারতচন্দ্রের ছন্দ ও ভাষার অনুবর্তনে দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এছাড়াও 'গৌরীবিলাস' ও 'দুর্গামঙ্গল' নামে পৃথক দুটি কাব্যে অন্নদামঙ্গলের প্রভাব সরাসরি লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্রের প্রগতিশীল চিন্তা উনিশ শতকীয় ভাবনার জন্য যেমন নতুন করে যাত্রা পথ তৈরি করে দিয়েছিল ঠিক তেমনই আধুনিকতার পথ তৈরি করে দিয়েছিল এই ভারতকবিই।

ভারতচন্দ্রের প্রাণনায় যে লৌকিক জীবনের সুর ও উনিশ শতকীয় চিন্তাধারা বেজে উঠেছিল তার প্রভাব আধুনিক কালের সাহিত্যেও প্রত্যক্ষ রূপে লক্ষণীয়। মদনমোহন তর্কালঙ্কার 'রসতরঙ্গিণী', 'বাসবদত্তা'য় রায় গুণাকরের ভাষা ছন্দের পাশাপাশি বিষয়ের রূপও কিছুটা গ্রহণ করেছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ লিখেছেন, "ভারতচন্দ্রকে পরাজয় করায় তর্কালঙ্কারের বাসবদত্তা রচনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।" অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হল ভিন্ন, তিনি বলেছিলেন যে ভারতচন্দ্রের উপর টেক্কা দেওয়ার কোনো অভিপ্রায়ই তর্কালঙ্কার মশাই এর ছিল না। সাহিত্যের নবযুগের বাস্তব জীবন রসের অনবদ্য রূপকার ঈশ্বরগুপ্ত তার গুরুঋণ শোধ করেছিলেন 'কবিবর

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবন বৃত্তান্ত নামক পুস্তিকা রচনায় এমনকি ঈশ্বরগুপ্তের যে ব্যঙ্গ, বক্রোক্তি সেগুলিও অনেকে ভারতচন্দ্রের প্রভাবিত বলে মনে করেন।

বটতলাতে যে সাহিত্য রসধারা গড়ে উঠেছিল সেখানে একটা বড় অংশে ভারতচন্দ্রের কাব্যের আলাদা কদর ছিল। এমনকি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যকলাতেও ভারতচন্দ্রের লৌকিক বোধের দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে। বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "কলকাতার সুতানুটির কবি কালীপ্রসাদের 'চন্দ্রকান্ত কাব্য' এবং 'কামিনীকুমার' 'রহস্যবিলাস' 'সুকুমার বিলাস' 'জীবন যামিনী' 'মধুমালতী' 'সতীত্ব সুধাসিন্ধু' 'প্রেমোপদেশ' নাটক, 'স্ত্রীলোকের দর্পচূর্ণ' ...প্রভৃতি বটতলার সাহিত্য মূলত বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরীর ধারা বহন করে চলল।" অনেক সমালোচক মনে করেন বঙ্কিমের ভারতচন্দ্রের প্রতি যতই বঙ্কিমী দৃষ্টি থাকুক "বঙ্কিমের সচেতন মন যতই ভারতচন্দ্রকে দূরে ফেলতে চাক না কেন, তার শিল্পী চেতনায় বিদ্যাসুন্দর গভীরভাবে তার অন্তর্ভেদী শিকড় মেলে দিয়েছিল।"[৪৮] বলা বাহুল্য বিদ্যাসুন্দরের নীতিহীন ভোগলোলুপতাই বাঙালির দৃষ্টিকে অনেক সচেতন করেছিল, অন্দরমহলের অনেক গোপন কথার ব্যাধি মুক্তি ঘটল। আমরা 'নারীগণের পতিনিন্দা' শীর্ষক অংশে যে নারীর ক্ষমতা ও অধিকারের কথা, যে অনড় যুক্তিবাদের কথা দেখতে পেলাম তা পরবর্তীকালে মধুসূদন, দীনবন্ধুর হাতে পরিণতি লাভ করেছে। এমনকি কবিওয়ালাদের চটুল রসিকতাও ভারতচন্দ্রেরই ফল।

তথ্যসূত্র

১। 'বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা', বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, তৃতীয় সংখ্যা মার্চ, ১৯৮৯, পৃ. ১১।
২। 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্য', অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, ৫ম সংস্করণ, কলকাতা-৯, পৃ. ৫৯।
৩। 'বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা', বাংলা বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২।
৪। অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল', রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ১৮-১৯।
৫। 'লিঙ্গবৈষম্য ও লোকসংস্কৃতি' বিশেষ সংখ্যা লোকসংস্কৃতি গবেষণা ২১ বর্ষ, ৮২ তম সংখ্যা, কার্তিক-চৈত্র ১৪১৫, কলকাতা-৭০০০৩৪, পৃ. ৩০৮।
৬। 'বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল', ঐ, পৃ. ৮৬।
৭। ঐ, পৃ. ৮৯।
৮। ঐ, পৃ. ১৯১।
৯। 'মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য আকাদেমী, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০১, পৃ. ২৬।
১০। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'দ্বিজমাধবের চণ্ডীমঙ্গল', ১৯৬০, পৃ. ৬২।
১১। 'মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল', সুকুমার সেন সম্পাদিত, সাহিত্য একাডেমী, ১৯৭৫, পৃ. ৫৯।
১২। 'রামেশ্বরের শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন', শ্রী যোগিলাল হালদার সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭, পৃ. ৫২।
১৩। ঐ, পৃ. ৮৩।
১৪। ঐ, পৃ. ৮৪।

১৫। ঐ, পৃ. ৮৯।
১৬। ঐ, পৃ. ১০৩।
১৭। ঐ, পৃ. ১০৪।
১৮। ঐ, পৃ. ১১০।
১৯। ঐ, পৃ. ২৭৩-৭৪।
২০। ঘনরাম চক্রবর্তী বিরচিত 'শ্রী ধর্মমঙ্গল' শ্রী পীযুষ কান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ২৫৮।
২১। ঐ, পৃ. ৩০৯।
২২। 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', সম্পাদক, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' চতুর্থ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪০৪, পৃ.-৩১৮।
২৩। ঐ, পৃ.-৩১৮-৩১৯।
২৪। ঐ, পৃ.-৩১৯।
২৫। 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা' ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বিশেষ সংখ্যা ভারতচন্দ্র-১ ষান্মাসিক পত্রিকা, ভাদ্র-মাঘ, ১৪০৯, ৭৮এ বিবেকানন্দ সরণী, কলকাতা-৭৮, পৃ. ৫৭।
২৬। 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী' (ঐ) পৃ. ৩১৯।
২৭। ঐ, পৃ.-৩২০।
২৮। ঐ, পৃ.-৩২০।
২৯। ঐ, পৃ.-৩২১।
৩০। ঐ, পৃ.-৩২১।
৩১। ঐ, পৃ.-৩২২।
৩২। ঐ, পৃ.-৩২২।
৩৩। ঐ, পৃ.-৩২৩।
৩৪। ঐ, পৃ.-৩২৩।
৩৫। ঐ, পৃ.-৩২৪।
৩৬। 'রামনারায়ণ তর্করত্ন; কুলীনকুলসর্বস্ব, সম্পাদনা, ড. সনাতন গোস্বামী প্রজ্ঞাবিকাশ ১ম সংস্করণ, ১৪১৩, পৃ. ৯৬।
৩৭। 'কবি ভারতচন্দ্র' : শঙ্করীপ্রসাদ বসু, মণ্ডল বুক হাউস, ১৩৮১, পৃ. ১৯২।
৩৮। 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ৩২৪।
৩৯। 'কবি ভারতচন্দ্র' : শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ঐ, পৃ. ১৯৩-১৯৪।
৪০। ঐ, পৃ.-১৯৪।
৪১। 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃ. ২৮৪।
৪২। ঐ, পৃ.-২০১।
৪৩। ঐ, পৃ.-২৯৭।
৪৪। ঐ, পৃ.-২৯৭।
৪৫। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, ঐ, পৃ. ৫৭।
৪৬। 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত', এস, ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ.-১৪০।
৪৭। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' উনিশ শতকীয় 'প্রগতি'র সূত্র সন্ধান, অপর্ণা রায়, 'মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা', ১ম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, কলকাতা, ভাদ্র-মাঘ, ১৪০৯, পৃ.-৪৪।
৪৮। ঐ.।

Nabagopal Roy, Asiatic Society, Kolkata

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলন দ্বারা সমাজের রূপান্তর সাধন

সুখেন্দু কুমার বাউর

জাতিবর্ণ চালিত প্রথাবদ্ধ ভারতীয় সমাজে শ্রী চৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রবর্তিত শুদ্ধ চরিত্র গঠন আন্দোলন ও বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার সমাজের স্থাবর কাঠামোতে প্রচণ্ড আঘাত করেছিল। সামাজিক অচলায়তনে তাঁরা আনলেন সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে সামাজিক সচলতা (Social Mobility)। এর দুটি ধারা। (১) একই সামাজিক শ্রেণির অর্ন্তগত অনুভূমিক বা সমস্তর সচলতা (Horizontal Mobility) এবং (২) ভিন্ন সামাজিক শ্রেণির অর্ন্তগত স্তরান্তরিত ক্রমোচ্চ সচলতা (Vertical Mobility)। শ্রীচৈতন্যপূর্ব মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজের স্তরবিন্যাসের ক্রমোচ্চ গড়নে (Hierarchical Structure) বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ মান ও স্থান ছিল। রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'তে বলেছেন, 'বৈষ্ণবধর্ম এক ভাবের উচ্ছ্বাসে সাময়িক অবস্থাকে লঙ্ঘন করিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, সাময়িক অবস্থার বন্ধন হইতে এক সুবৃহৎ সকলকে নিষ্কৃতি দান করিয়াছিল।'

সামাজিক সচলতা কী?

সমাজ গতিশীল ও চলমান। সমাজে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের স্তরবিন্যাস যেমন আছে তেমনি সামাজিক স্তরবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক ওঠানামা কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিপন্ন হয়। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে ব্যক্তি বা সমষ্টির সামাজিক স্তরবিন্যাস এক স্তর থেকে অন্য কোনো স্তরে পরিবর্তন করাকে সামাজিক সচলতা (Social Mobility) বলে। এ হল সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন।

ব্যক্তি মাত্রেরই মর্যাদা মূলত তার পিতামাতার মর্যাদার অনুগামী কিন্তু ব্যক্তি যদি ভিন্ন ধরনের ও ভিন্ন মানের শিক্ষালাভ করে বা পারিবারিক বৃত্তির পরিবর্তে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করে বা ভিন্নতর জীবনযাপনের রীতি (Style of Life) অনুসরণ করে তবে তা সামাজিক সচলতা হিসেবে বিবেচিত হয়। অধ্যাপক সরোকিন (Sorokin)-এর মতানুসারে স্বীয় চেষ্টায় কোনো ব্যক্তি নিজের সামাজিক মর্যাদার পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হলে সেই পরিবর্তিত সামাজিক স্তরই হল সামাজিক সচলতার দৃষ্টান্ত। বাস্তবে সামাজিক ব্যবধানের মধ্যেই সামাজিক সচলতা প্রতিপন্ন হয়। পিতামাতার সামাজিক স্তর থেকে কোন ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত উচ্চস্তরে আরোহণ বা নিম্নস্তরে অবরোহণ সামাজিক ব্যবধানের সূত্রপাত ঘটায়। সামাজিক সচলতা মূলত দু-ধরনের ঃ অনুভূমিক

বাউর, সুখেন্দু কুমার : গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভাবান্দোলন দ্বারা সমাজের রূপান্তর সাধন
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 25-40